স্বামী বিবেকানন্দ

নিতাই বসু

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ এক ॥

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদিকালে হিন্দু-ধর্ম বলে কিছু ছিল না। বিদেশ থেকে বিভিন্ন জাতি ভারতে আসার পর তাদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে নিজেদের আলাদা সত্তার সংরক্ষণ করতে গিয়ে নিজেদের ধর্মীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করতে আগ্রহী হল এবং তখনই বেদসম্ভূত সুপ্রাচীন সনাতন ধর্মকে তারা আখ্যা দিল হিন্দু-ধর্ম বলে। এর ফলে ভারতবাসীদের মনে এক ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা দিল। তারা নিজেদের হিন্দু বলে ভাবতে শিখল এবং অন্যদের মনে করত ভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী। ধর্মান্ধতা যেন আধ্যাত্মিকতার আসন কেড়ে নিল।

যে-সব অবনতির কারণ অনুপ্রবেশ করে বৌদ্ধযুগের পতন ঘটছিল, নেতিবাদ ও নির্বিচার সন্ন্যাসগ্রহণ-প্রথা সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। এইসব প্রথার বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজ নিজস্ব বিবিধ অনুশাসন চালু করল। বিদেশে যাওয়া প্রায় নিষিদ্ধ হল, হিন্দু রাজশক্তির অভাবে পুরোহিত-সমাজ নিজেদের হাতে সমস্ত দায়িত্ব তুলে নিলেন। মুসলমানেরা যাতে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করতে না পারে সেজন্য হিন্দুর জাতিভেদ-প্রথা সমাজে আরও দৃঢ়ভাবে প্রচলিত হল এবং মুসলমানদের অনুকরণে নারীদের

অবরোধ-প্রথা হিন্দুসমাজও মেনে নিল। এর ফলে সমাজে ধর্মের নামে নানাধরনের অন্তর্ঘাতী অনাচার দেখা দিল, দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেল এবং রোগ, অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ক্রমেই সামাজিক অবস্থাকে বিধ্বস্ত করতে থাকল।

ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, শিল্প, বাণিজ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত যখন বিব্রত ও দিশাহারা, তখন এদেশে এল বিভিন্ন পাশ্চাত্য জাতি। ওলন্দাজ, ফরাসি বা পর্তুগীজ প্রভৃতি জাতি এদেশে বাণিজ্য করতে এসেছিল, ভারতের কয়েকটি ভূখন্ড তারা দখলও করেছিল কিন্তু ইংরেজের মতো শক্তি, সাহস ও ক্ষমতা নিয়ে এদেশে সামগ্রিক প্রভুত্ব বিস্তার আর কোনো জাতি করতে পারেনি। মুসলমানদের মতো যুদ্ধ করে রাজ্যদখল, সম্পত্তি-লুঠ ও ধর্মান্তরিত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা চেয়েছিল বাণিজ্যের সূত্রে ধনলুণ্ঠন করতে, এদেশের মানুষের মধ্যে নিজেদের সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার করে আভিজাত্যলাভের লালসা জাগিয়ে তুলতে। আগেকার বিদেশি শক্তিগুলো নিজেদের সভ্যতাগর্বী বলে কখনও প্রচার করেনি কিন্তু ইংরেজরা ভারতীয়দের কাছে মূলত শাসক ও শোষকরূপেই আবির্ভূত হল। তাদের সাংস্কৃতিক অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল, ভারতবর্ষের জনসাধারণ তাদের অন্দরমহলে ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলেও ইংরেজ প্রভুদের সঙ্গে যখন প্রয়োজনীয় আদান-প্রদান করবে তখন তারা সর্বতোভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ করবে এবং ওই সংস্কৃতির আনুগত্য স্বীকার করবে।

এই উদ্দেশ্যেই এদেশে প্রচলন হল তাদের শিক্ষাপদ্ধতি যার প্রধান লক্ষ্য ছিল এক শ্রেণীর করণিক সৃষ্টি করা। ইংরেজ চেয়েছিল, যেন এই শ্রেণীর লোকেরা ইংরেজের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়। পাঠ্যপুস্তক, সংবাদপত্র ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে ইংরেজ এদেশে মানুষকে বোঝাতে শুরু করেছিল, এদেশের মানুষের জীবনে এমন কোনো বিশেষত্ব নেই যা আধুনিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অপরিহার্য। ভারতবর্ষকে যদি উন্নত হতে হয় তাহলে বেশ-

ভূষা,খাদ্য, আদব- কায়দা, ব্যক্তিগত ধর্ম ইত্যাদি সবকিছুর পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের জন-জীবনে ওদের প্রচলিত সভ্যতাই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য মনীষীরা প্রমাণ করলেন, অতীতে ভারতে যে-সব মহৎ চিন্তার আবির্ভাব ঘটেছিল কিংবা শিল্প-বিজ্ঞানে যে-সব উন্নতি হয়েছিল— গ্রীস, মিশর বা আরবের অনুসরনেই ভারতবর্ষে তা ঘটানো হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতার কোনো উপাদানই মৌলিক নয়। ভারতের বেদান্ত স্বপ্নবিলাসীর অলীক চিন্তা মাত্র; ভারতের বেদ চাষীর সংগীত ছাড়া আর কিছুই নয়; ভারতের ধর্ম এক নিম্নতর সভ্যতার পরিবেশে উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট। তাই উন্নততর সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষের তথাকথিত সভ্যতার ধারা বর্জন করা উচিত।

ইংরেজের এই প্রচারে সাময়িকভাবে ভারতীয় সমাজ বিভ্রান্ত হয়েছিল। তারা নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতিকে সময়োপযোগী করে না তুলে পরানুকরণ, পরানুবাদ ও দাসসুলভ দুর্বলতার আশ্রয় নিয়েছিল। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ তখন ইংরেজের মতো পান-ভোজন, বিলাস-ব্যসন, পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে ব্যস্ত। আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা, জড়বাদ ও নাস্তিকতার ত্রিমুখী প্রতিকুলতায় ভারতীয় সমাজ বিধ্বস্ত হচ্ছিল। একদিকে খ্রিস্টান মিশনারিরা হিন্দুধর্মের নিন্দায় শতমুখ এবং ছলে-বলে-কৌশলে ধর্মান্তরিত করতে দৃঢ়সংকল্প, অন্যদিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার মূল সুর অনুধাবনে অক্ষম একদল মানুষ সামাজিক রীতি-নীতির মূলোচ্ছেদ করতে কৃতসংকল্প। এই যুগপৎ আক্রমণের বিরুদ্ধতা করে ভারত শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিল। তার কারণ ভারতের এক সুমহান অন্তর্নিহিত শক্তি যা যুগে-যুগে অভিনব সাধনপ্রণালী আবিষ্কার করেছে, যা সত্য, সনাতন ও সহনশীল।

সেকালে দেশকে যাঁরা নতুন পথে চালাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ও পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। নিরাকার একেশ্বরের উপাসনার জন্য তিনি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে

প্রতিষ্ঠা করলেন 'আত্মীয় সমাজ', তেরো বছর বাদে যেটি পরিণত হল 'ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা 'একেশ্বরবাদ সমিতি'-তে। এই প্রতিষ্ঠানই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হল। এরপর ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে দয়ানন্দ সরস্বতী মুম্বাইতে 'আর্যসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধরনের ধর্মান্দোলন প্রধানত সমাজ ও ধর্মের সংস্কারকে নিজেদের সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টার অন্যতম মূল উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে এবং ভগবৎ-প্রেরণার বদলে বিচারসহ ও বুদ্ধিনির্ভর সাধনাবলীকে প্রাধান্য দিয়ে একটি নতুন পথের প্রবর্তন করে।

ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় মানুষেরা ধর্মক্ষেত্রে একেশ্বরবাদী, মূর্তি-পূজাবিরোধী, গুরুবাদে অবিশ্বাসী ও অবতার-বাদের প্রচণ্ড বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁরা সমাজে নারীশিক্ষার প্রসার, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও জাতিভেদ-প্রথা বন্ধ করার দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাঁরা বাল্যবিবাহ প্রথাও উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন এই রীতিগুলো অমান্য করতে চাওয়ার ফলে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীরা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন এবং কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে রইল 'নববিধান সমাজ'।

রাজা রামমোহন রায় সমসাময়িক ভারতে একটা উদার প্রগতিশীল মনোভাব সংক্রামিত করতে চেয়েছিলেন এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। সতীদাহ-প্রথা নিবারণ ও সমুদ্রযাত্রা-প্রবর্তনে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। কিন্তু তাঁর চিন্তারাজ্যে কয়েকটি অবাস্তব বৈশিষ্ট্যের জন্য সামাজিক পরিবর্তনে তাঁর ভূমিকা ততটা সফল হয়নি। তিনি মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মতো প্রতিমাপুজোকে পৌত্তলিকতা বলে মনে করেছিলেন এবং তাদেরই চিন্তা সম্পৃক্ত ভাষায় নিন্দাও করেছিলেন। তাঁর মতে, পৌত্তলিক সমাজে নৈতিকতার অবনতি ঘটে, অবৈধ সম্বন্ধের পথ উন্মুক্ত হয় এবং আত্মহত্যা, নারী-হত্যা, নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতির উদ্ভব হয়। পৌত্তলিক জাতির মধ্যে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয় না, সেখানে মূর্খতাই প্রশ্রয় পায়। ইংরেজদের মতো রামমোহনও সহমত প্রকাশ করলেন, জাগতিক উন্নতির জন্য হিন্দুদের উচিত নিজেদের ধর্ম সংশোধন করা।

রামমোহনের অভিমত ছিল একটা যুক্তিনির্ভর সার্বভৌম ধর্মকে অবলম্বন করে ভারতীয় সমাজকে সুসংবদ্ধ ও সতেজ করে গড়ে তোলা। বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত করে তিনি ভারতবাসীকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রদানেরও স্বপ্ন দেখেছিলেন বলে মনে হয়। অন্তত তাঁর ব্যক্তি জীবনে তার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। তিনি ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার করে স্বদেশকে পাশ্চাত্য জ্ঞান- বিজ্ঞানে সুসমৃদ্ধ ও এশিয়াখণ্ডের নেতপদে অধিষ্ঠিত দেখতেও চেয়েছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনও হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মকে কেন্দ্র করে তেমন কোনো সংঘাতের মধ্যে যাননি। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান সমাজ ক্রমশ উগ্রপন্থা অবলম্বন করে হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিবাহ ও আহার-বিহারে জাতিভেদ অস্বীকার করল এবং নববিধান সমাজ বিভিন্ন ধর্মের সারাংশ গ্রহণ করে, বিশেষত যীশুখ্রিস্টকে প্রাধান্য দিয়ে, এক নব ধর্মমত প্রবর্তনায় প্রবৃত্ত হল। যদিও যৌবনে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথেরই শিষ্যস্থানীয় ও সহকারী ছিলেন। কিন্তু ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে উভয়ের মধ্যে মতান্তর ঘটল, কেশবচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে যীশুখ্রিস্টের প্রচার আরম্ভ করলেন। এজন্য ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে তুমুল শোরগোল শুরু হয়ে গেলে কেশবচন্দ্র অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহাপুরুষদের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লাগলেন। এমনকি, বিভিন্ন ধর্মমতের বিশিষ্ট বাণী উদ্ধৃত করে সমাজের উপাসনাকালে ব্যবহার করতে থাকলেন। তিনি উপাসনার সময় বৈষ্ণবোচিত ভক্তি-সাধনার রীতি অনুসারে কীর্তন গানের আয়োজনও করতেন।

তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজনকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশাধিকার দিলেন এবং প্রচার করলেন হিন্দুদের দেবদেবীর পৌত্তলিক রূপের মহিমা আছে। সেগুলো এক-একটি ভাবের প্রতীক। কিন্তু একটি সার্বভৌম ধর্মের প্রবর্তন করতে চাইলেও তিনি সর্বতোভাবে কোনো ধর্মকেই গ্রহণ করলেন না। ওঁর প্রবর্তিত ধর্মে স্থান হল